পাঠ্যপুস্তকের নিয়মে

তাওহীদ ও শিষ্টাচার

লেখকঃ

শায়খ আব্দুর রাকীব বুখারী মাদানী

গ্রাজুয়েট, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, মদীনা।

এম.এ. জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া, নতুন দিল্লী।

সম্পাদনাঃ

শায়খ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

توحيد و آداب شرعية

تأليف: عبد الرقيب بن رضاء الكريم

خريج كلية الشريعة (الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)

ماجستر: جامعة ملية إسلامية نيو دلهي

আলোকিত প্রকাশনী

সূচীপত্র

» প্রথম প্রকাশের ভূমিকা ৫

» দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা: ৮

তাওহীদ

» মহান আল্লাহ ১১

» ফেরেশতা ১৪

» আল্লাহর গ্রন্থ ১৭

» নবী ও রাসূল ২০

» শেষ দিন ২২

» ভাগ্য / তাকদির ২৫

» আল্লাহর সর্বোচ্চ আদেশ ২৭

» আল্লাহর সর্বোচ্চ নিষেধাজ্ঞা ৩০

» ইবাদত ৩৪

আদব ও শিষ্টাচার

» আদর্শ মুসলিম ৩৯

» বিসমিল্লাহ্..... ৪২

» সালাম ও অভিবাদন ৪৫

» পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা..... ৪৮

» খাওয়া ও পান করার আদব ৫০

» দুআ ও যিকর..... ৫২

» পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার..... ৫৬

» অযু শিক্ষা..... ৬০

» নামায শিক্ষা ৬৪

মহান আল্লাহ

মহান আল্লাহ সারা জগতের সৃষ্টিকর্তা, সব কিছুর প্রতিপালক, রুযীদাতা, জীবন ও মরণ দাতা। তিনি এই বিশাল আকাশ ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সাত আকাশের উপর আরশে (সিংহাসনে) সমুন্নত হয়েছেন। সেখান থেকেই তিনি বিশ্ব জগৎ পরিচালনা করে থাকেন।

মহান আল্লাহ এক (অদ্বিতীয়), তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, কিন্তু সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন। তাঁর সমতুল্য কেউই নয়। মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

- **উচ্চারণ:** ক্বুল হু ওয়াল্লাহু আহাদ (১) আল্লাহুস্ স্বামাদ (২) লাম্ ইয়ালিদ্ ওয়ালাম্ ইউলাদ (৩) ওয়ালাম ইয়াকুল লাহু কুফুআন্ আহাদ্ (৪)

- **অর্থ: বল, তিনি আল্লাহ একক (অদ্বিতীয়)। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন। এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।** [সুরা ইখলাস]

মহান আল্লাহ অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যা চান তা হয় আর যা চান না, তা কখনও হয় না। যখন তিনি কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন, তখন তার জন্য শুধু বলেন 'হও'। আর তৎক্ষণাত তা হয়ে যায়। তাঁকে ঘুম ও তন্দ্রা কিছুই স্পর্শ করে না।

আল্লাহর গ্রন্থ

মহান আল্লাহ উদ্দেশ্যে ছাড়াই মানুষকে সৃষ্টি করেন নি; বরং তাদের সৃষ্টির পিছনে রয়েছে মহৎ উদ্দেশ্য। তাই তিনি তাদের উপর কিছু আদেশ ও নিষেধ অর্পণ করেছেন এবং তাদের মঙ্গল ও অমঙ্গল সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন।

এসব জানিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি নবী-রাসূলদের মাধ্যমে তাঁর কিতাব (বই) প্রেরণ করেছেন। সেই বইগুলিতে তাঁর আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ বর্ণিত হয়েছে। যখন থেকে তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে তিনি মানব জাতিকে সুপথে পরিচালিত করার জন্য বহু কিতাব ও "ছহীফা" (পুস্তিকা) নবীগণের মাধ্যমে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। তন্মধ্যে বিশেষ চারটি কিতাবের নাম হচ্ছে:

ক. (তাওরাত), যা নবী মূসা (আঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল।

খ. (যবূর), যা নবী দাঊদ (আঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল।

গ. (ইঞ্জীল), যা নবী ঈসা (আঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল।

ঘ. (আল্ কুরআন), যা আল্লাহর পক্ষ হতে সর্বশেষ কিতাব, তা অবতীর্ণ হয়েছে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি।

পবিত্র কুরআন একটি মর্যাদাসম্পন্ন বই। এই বইয়ের মাধ্যমে পূর্বের বই সমূহকে সত্যায়ণ করা হয়েছে, সে সবের বিধান রহিত করা হয়েছে এবং আমাদের কেবল এরই অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।

ভাগ্য / তাকদির

মহান আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞান অনুযায়ী সৃষ্টিকূলের জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাই হচ্ছে ভাগ্য বা তাকদির।

আল্লাহ তাআ'লা তাঁর জ্ঞান দ্বারা সকলের ভাগ্য লাওহে মাহফুযে (সংরক্ষিত ফলকে) লিখে রেখেছেন। সৃষ্টি জগতের সব কিছু তাঁর ইচ্ছায় হয়ে থাকে। তিনি যা চান তা হয়, আর যা চান না, তা হয় না। কোনো কিছুর অস্তিত্বে আসার পূর্ব থেকেই তিনি সে সম্পর্কে অবগত। মানুষ যা কিছু করে, তা করার পূর্ব থেকেই তিনি তা জানেন।

তিনি আমাদের ভাগ্যে যা লিখে দিয়েছেন তাই ঘটে। তাই অনেকে কোনো কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও তা পায় না। অর্থাৎ সেটা তার ভাগ্যে নেই বলে সে পায় না। নচেৎ চেষ্টা করলে পাওয়ার কথা।

যেহেতু তিনি পূর্ব থেকে অবগত যে, মানুষ ভবিষ্যতে কী করবে, তাই তিনি লিখে রেখেছেন। এমন নয় যে, তিনি তক্বদীরে লিখেছেন বলে মানুষ তা করতে বাধ্য।

ভাগ্যের দোহাই দিয়ে কোন কাজ না করা কিংবা পাপ কাজ না ছাড়া কখনও উচিত নয়। শরীয়তে এর নিষেধ এসেছে।

মানুষের সামনে খাবার থাকলে সে যেমন এ বলে তা ছেড়ে দেয় না যে, ভাগ্যে থাকলে খাব নচেৎ খাব না; বরং হাত দিয়ে সে তা খায়, তেমন ভাগ্যের কারণে কিছু করবো না বা যা মন্দ কাজ করছি, তা ত্যাগ করবো না বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

মনে রাখা ভালো যে, ভাগ্য নিয়ে বেশী তর্ক-বিতর্ক করা উচিত

আদর্শ মুসলিম

আমরা মুসলিম, আমরা ভদ্র। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বাণী আমাদের আদর্শ। তাই আমাদের আদর্শবান হওয়া উচিত।

*ভদ্র মুসলিমের কেউ সহযোগিতা করলে সে বলে: "জাযাকাল্লাহু খাইরান"। অর্থাৎ, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিক। কিংবা বলেঃ আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুক কিংবা বলেঃ আপনাকে ধন্যবাদ।

*ভদ্র মুসলিম অন্যকে ক্ষমা করে এবং তাকে কেউ কষ্ট দিলে ধৈর্য ধারণ করে।

*ভদ্র মুসলিম যখন তার থেকে বয়সে বড় ব্যক্তিকে ডাকে, তখন তার নাম ধরে ডাকে না বরং সম্মান দিয়ে ডাকে। আর যখন তার সমবয়সী কাউকে ডাকে, তখন ভাই বলে ডাকে কিংবা তার পছন্দনীয় নাম ধরে ডাকে।

*আদর্শ মুসলিম অন্যের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করে। কথা-বার্তায় নম্রতা বজায় রাখে। অনর্থক কথা বলে না এবং তর্ক করা অপছন্দ করে।

*ভদ্র মুসলিম অন্যের সম্মান করে, তাদের পেশা যাই হোক না কেন। তাই সে চাকর-চাকরানী এবং ঝাড়ুদারদের উপহাস করে না।

*মুসলিম তার ভাইয়ের খুশিতে খুশি হয় এবং তার ব্যথায় ব্যথিত হয়।

*ভদ্র মুসলিম নিয়ম প্রিয় হয়, তাই সে অফিস আদালতে

সালাম ও অভিবাদন

সালাম একটি সুন্দর ইসলামী আদব বা অভিবাদন। কোন মুসলিম ব্যক্তির অপর মুসলিম ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হলে বলবেঃ (আস্ সালামু আলাইকুম- ওয়া রাহমা তুল্লাহি ওয়া বরাকাতুহু)। এই চমৎকার বাক্যটির অর্থ হলোঃ তোমার প্রতি আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

আসলে এটি একটি দুআ যা সাক্ষাতের সময় এক অপরের জন্য করা হয়। এই ভাবে কেউ সালাম দিলে তার উত্তরে বলতে হয়ঃ (ওয়ালাই কুমুস্ সালাম্ ওয়া রাহমা তুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু)। অর্থাৎ তোমার উপরও আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

এটি একটি এমন অভিবাদন, যা মানুষের সুখ, দুঃখ, সুস্থ, অসুস্থ, দিন, রাত সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই আমাদের মুসলিম ভাইকে বিনা দ্বিধায় ও লজ্জায় সালাম দেওয়া উচিৎ।

এক অপরকে সালাম দিলে আপসে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, হিংসা বিদ্বেষ দূর হয়, পাপ ক্ষমা হয় এবং শান্তি বর্ষিত হয়।

বাইরে থেকে ঘরে প্রবেশ করার সময় সালাম দিলে নিজের এবং পরিবারের কল্যাণ হয়।

সালামের কিছু আদব ও নিয়ম আছে,যেমন:

❖ সালাম দেওয়ার সময় উপরে বর্ণিত পূর্ণ বাক্য দ্বারা সালাম দেওয়া।

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার

মহান আল্লাহ আব্বা আম্মার সম্পর্কে কুরআনে বলেছেন:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

- **অর্থ: তোমার রব্ব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি ভাল ব্যবহার করবে; তাদের মধ্যে একজন কিংবা দু'জনে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে পৌঁছে গেলে তাদের (বিরক্তিসূচক শব্দ) 'উ:' বলো না এবং তাদের ধমক দিওনা; বরং তাদের সাথে সম্মানসূচক নম্র কথা বলো।** [সূরা ইসরা/২৩-২৪]

পিতা-মাতা এ জগতের অমূল্য রত্ন। তারা বড় কষ্ট সহ্য করে আমাদের লালন-পালন করেন, আহারের ব্যবস্থা করেন, বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন, পরিধানের ব্যবস্থা করেন, ভাল-মন্দের পার্থক্য শিক্ষা দেন, পড়া-শোনার ব্যবস্থা করেন, অসুখ হলে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, আমরা কষ্টে থাকলে তাঁরা কষ্ট পান আর আমরা সুখে থাকলে তারা আনন্দ পান।

এ কারণে মহান আল্লাহ আমাদের উপর ফরয করেছেন, যেন আমরা পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করি এবং তাদের কোনো অবস্থাতে কষ্ট না দেই। আর তারা বৃদ্ধ হয়ে গেলে যেন আমরা তাদের আরোও বেশী বেশী যত্ন নেই।

নামায শিক্ষা

নামায ফারসি শব্দ, যার আরবী শব্দ হচ্ছে সালাত। সালাত তাওহীদের পর ইসলামের দ্বিতীয় রুকন বা স্তম্ভ। সালাত যা মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি জরুরি করেছেন তা দিবা-রাতে পাঁচ বার। ফজর: দুই রাকাআত। যুহর: চার রাকাআত। আসর: চার রাকাআত। মাগরিব: তিন রাকাআত। ইশা: চার রাকাআত।

এর মধ্যে আসর এবং যুহরের সালাতকে বলা হয় সির্রি সালাত; অর্থাৎ এই সালাতদ্বয়ে ইমাম নীরবে দুআ ও সূরা পাঠ করবেন। আর ফজর, মাগরিব এবং ইশার সালাতকে বলা হয় জাহরী সালাত; অর্থাৎ এসব সালাতে ইমাম সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা সরবে পাঠ করবেন।

সালাত আদায় করার নিয়ম:

১. সালাত আদায় করার সময় সর্বপ্রথমে সুন্দর করে অযু করবে অত:পর কিবলামুখী হবে এবং ফরয কিংবা নফল যা আদায় করতে চাইবে ও যত রাকাআত আদায় করতে চাইবে তার মনে মনে সংকল্প নিবে, মুখে কিছু পাঠ করতে হবে না।

২. তাকবীরে তাহরীমা (আল্লাহু আকবার) বলে সালাত শুরু করবে এবং এই তাকবীর বলার সময় দুই হাত বাহু বরাবর কিংবা কানের লতি বরাবর এমন ভাবে তুলবে যেন হাতের তালু কিবলামুখী থাকে। অত:পর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখবে এবং সাজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি রাখবে। তাকবীরে তাহরীমা সালাতের রুকন যা ব্যতীত সালাত হয় না।